৩. **হিটলারের প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণনীতির কোনও যৌক্তিকতা ছিল?** (ক. বি. ২০০২)

অথবা

তোষণনীতি বলতে কী বোঝ? ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের হিটলারের প্রতি এই নীতি গ্রহণের কি কোনও যুক্তি ছিল? (ক. বি. ২০০৪)

অথবা

তোষণনীতি উৎস বিশ্লেষণ করো। এই নীতি কী যুক্তিসঙ্গত ছিল? (ক. বি. ২০০৮)

অথবা

তোষণনীতি বলতে কী বোঝায়? ফ্যাসিবাদী দেশগুলির প্রতি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণনীতি গ্রহণ কি তুমি সমর্থন করো? (ক. বি. ২০১০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিরিশের দশক ইউরোপের ইতিহাসে এক অতি সংকটময় সময়। আর্থিক মহামন্দার জের, সেই সঙ্গে একনায়কতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির জঙ্গি

Scanned with CamScanner

বিস্তারধর্মী পরিকল্পনা সব মিলে লিগের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। এই সময় ব্রিটেন ও ফ্রান্স একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির বিরোধিতা না করে আপসমুখী নীতি নেন। এই আপসমুখী নীতিই তোষণ নীতি নামে পরিচিত। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বহু রাষ্ট্রনেতারা একনায়কদের জাতীয় নেতা হিসেবে গণ্য করেন। এদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখান। তাঁরা বলেন যে, লিগ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। তাঁরা ভাবেন যে, একনায়কদের ন্যায্য দাবি দাওয়া মেনে নিলে ইউরোপে শান্তি ফিরে আসবে। একনায়কতন্ত্রকে অনেকেই মনে করতেন ইউরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির রক্ষাকর্তা। সাম্যবাদের হাত থেকে এরা ইউরোপকে রক্ষা করবেন। এমনটাই ছিল তাদের বিশ্বাস।

পাশ্চাত্যের দেশগুলো কেন তোষণ নীতি অনুসরণ করল সেই নিয়ে ঐতিহাসিকরা দুটি মত পোষণ করেছেন। জে হুইলার, বনেট, মার্টিন গিলবার্ট, ট্রেভার রোপার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা তোষণ নীতিকে অদূরদর্শী নীতি রূপে দেখেছেন। তাঁরা বলেন এই নীতি গ্রহণই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। ষাটের দশক থেকে প্রচলিত এই ব্যাখ্যায় কিছু পরিবর্তন আসে। এ. জে. পি টেলর দেখান যে, ব্রিটিশরা সুপরিকল্পিত ভাবে এই নীতি অনুসরণ করেনি। এফ. এস নর্থেজ বলেন ব্রিটিশদের লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে বাণিজ্য পরিচালনা। তাই তারা তোষণ নীতি গ্রহণ করে। রবিনস্ মন্তব্য করেছেন যে, তোষণ নীতি যে কোনও রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য নীতি। কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতিতে এই নীতি সফল হতে পারেনি।

তোষণ নীতির চরিত্র এবং একে বলবৎ নিয়েও বহু বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ঐতিহাসিকদের একাংশ বলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সময়কাল থেকেই জার্মানি সম্পর্কে নমনীয় মনোভাবে সূচনা। টেলর বলেছেন, বিশের দশক থেকেই জার্মানির প্রতি তোষণ নীতি অনুসরণের সূচনা। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লোকার্নো চুক্তি এর সর্বোচ্চ পর্যায়। কিন্তু এই তোষণ নীতি অনুসরণ সম্বন্ধে বিশের দশক ও ত্রিশের দশকের সাধারণীকরণ যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ স্ট্রেসম্যানের সময় সহাবস্থানপন্থী জার্মানি আর হিটলারের সময়ে সম্প্রসারণ নীতি জার্মানির অবস্থা এক রকম ছিল না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তোষণ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। প্রচলিত মত এমনটাই। কিন্তু বাস্তবে চেম্বারলেন ছাড়াও বলডুইন বা অন্যান্য অনেক ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ তোষণ নীতি অনুসরণ করেন। ব্রিটেন বরাবরই মহাদেশীয় রাজনীতিতে নিরাসক্ত হলেও তবে ব্রিটেন মহাদেশীয় রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর ছিল। এই জন্য পোল্যান্ড ও রোমানিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়।

Scanned with CamScanner

ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ নীতি গ্রহণের পূর্ব পটভূমি হলো যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমশ অচল হয়ে পড়লে ইতালির আবিসিনিয়া আক্রমণ বা জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে লিগের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ইতালি ও জার্মানির সাহস উস্কে দেয়। জার্মানি ও ইতালি পারস্পরিক বিদ্বেষ ভাব ত্যাগ করে পরস্পরের কাছাকাছি আসে। ১৯৩৬-এ রোম-বার্লিন একনায়কতন্ত্রী কূটনৈতিক জোট তৈরি হয়। এ দিকে ফ্রান্স আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পরিস্থিতির চাপে নাজেহাল হয়ে আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠে। জার্মান বিরোধী নীতি ত্যাগ করে ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সও আপসপন্থী হয়ে যায়।

মোটামুটি ১৯৩৬ থেকে নীতির রূপায়ণ শুরু হয় ১৯৩৮ পর্যন্ত তোষণ নীতি প্রায় প্রত্যক্ষ ভাবে জার্মান সম্প্রসারণের পথ প্রস্তুত করে। ১৯৩৯-এ ফ্রান্স ও ব্রিটেন তোষণ নীতি ত্যাগ করলে জার্মানি অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে।

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হিটলার ভার্সাই চুক্তি ও লোকার্নো চুক্তি ভঙ্গ করে রাইন অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও কোনও দৃষ্টান্তকারী পদক্ষেপ নেয় না। জার্মানি একে পাত্তা দেয় না। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজতন্ত্রের সমর্থক কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব স্থানীয়রা বিদ্রোহ করে। জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ছিলেন এই বিদ্রোহের সংগঠক। প্রজাতান্ত্রিক সরকার এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ডাক দেন। স্পেনে এক গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ইতালি, জার্মানি ও পর্তুগাল ফ্যাসিস্ট শক্তির পক্ষ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ১ লক্ষ ৫০ হাজার ইতালীয় সৈন্য ফ্যাসিস্ট পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। জার্মানি ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক ও অন্যান্য রণসম্ভার দিকে বিদ্রোহীদের সাহায্য করে। পাঁচ হাজার বিমান সেনা পাঠায়।

স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারের পাশে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, পোল্যান্ড, জার্মানি ও ইতালির অগণিত মানুষের সমর্থন থাকলেও সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া কোনও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় অস্ত্র বা যুদ্ধের রসদ দিয়ে সাহায্য করেনি। যদি বিদেশি রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলত তাহলে হয়তো এই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হতো।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ যাতে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে না পড়ে সেই জন্য ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের নেতৃত্বে অপরাপর ২৭টি ইউরোপীয় রাষ্ট্র স্পেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। হস্তক্ষেপ বিরোধী সমিতি (Non-Intervention Committee) গঠিত হয়।

Scanned with CamScanner

ইতালি ও জার্মানি মৌখিক ভাবে এই নীতির প্রতি আনুগত্য দেখালেও ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান বন্ধ রাখেনি।

অধ্যাপক স্মিথ দুঃখ করে বলেছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো যদি ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিত তাহলে শুধুমাত্র স্পেনের সংকট মুক্তিই নয়—'জার্মানি ও ইতালির পক্ষে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত করা সম্ভব হতো না।

ব্রিটেন ও ফ্রান্স খুব সতর্ক ভাবে স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার নীতি নেয়। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে নিরপেক্ষ থাকে। ফ্রান্স ভেবেছিল, প্রকাশ্য ভাবে প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করলে ইতালি ও জার্মানির সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। ফ্রান্স যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে রাজি ছিল না।

ব্রিটেনের রক্ষণশীল রাজনৈতিক দল সোভিয়েত সাহায্য প্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন ছিল। ইংল্যান্ডে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আই. মাইস্কি তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছেন যে ব্রিটিশ সরকার স্পেনের প্রজাতন্ত্রী সরকারকে সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র রাজি নয়। বরং ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করলে ব্রিটিশ সরকার ভূমধ্যসাগরে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। এমনটাই তাদের ধারণা।

এ. জে. পি. টেলর মনে করেন স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহের জন্য প্রধানত দায়ী ছিল ব্রিটিশ ও ফরাসি নিষ্ক্রিয়তা।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে জার্মানির সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তি করণের সময় ইঙ্গ-ফরাসি মিত্রপক্ষের দুর্বলতা আবার প্রকাশ্যে আসে। হিটলারের সম্প্রসারণের প্রথম পদক্ষেপ ছিল এটি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হ্যালিফাবত্র এই ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকেন এবং জার্মানির প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখান।

অস্ট্রিয়া দখলের পর হিটলারের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল চেকোস্লোভাকিয়া দখল। চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চলে সাড়ে তিন মিলিয়ন জার্মান বসবাস করত। এদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে কেন্দ্র করে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া পশ্চিম শক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সুদেতান জার্মানিদের সমস্যার যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন শান্তিপূর্ণ পথে হিটলারকে চেক সমস্যা সমাধানের আর্জি জানান। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, চেকোস্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত সমস্যায় ব্রিটেনের অনুপ্রবেশের ফলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে গেছে।

Scanned with CamScanner

মুসোলিনির মধ্যস্থতায় চেকোস্লোভাকিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির মধ্যে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে চেকোস্লোভাকিয়ার ১১০০০ বর্গমাইল (সুদেতান অঞ্চল) জার্মানিকে দেওয়া হয়।

চেম্বারলেন ভেবেছিলেন হিটলারের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে গেলে ব্রিটেনের পক্ষে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। ব্রিটিশ নীতি ছিল আদর্শবাদ ও জাতীয় স্বার্থের সংমিশ্রণ। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বন ও চেক রাষ্ট্রপ্রধান বেনেস আপোসপন্থী ছিলেন। বন্ মানসিক দিক থেকে চেক সমস্যার সঙ্গে জড়াননি। উল্টে ব্রিটেনের উপর সমস্ত দায় চাপিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছিলেন। টেলর বন্‌কে তোষণ নীতির মূর্ত রূপ বলেছেন। অন্য দিকে চেকোস্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বেনেস এই আপস সম্মতি দেন। এই মিউনিখ চুক্তি শুরু থেকেই দুটি ত্রুটিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছিল। প্রথমত, এই চুক্তিতে সোভিয়েত রাশিয়াকে ইচ্ছাকৃত ভাবে বাইরে রাখা হয়। মিউনিখ চুক্তিতে চেকোস্লোভাকিয়াই অংশগ্রহণ করেনি।

হিটলার এই মিউনিখ চুক্তির শর্তেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হিটলার চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করেন।

এর পরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ক্রমশ জার্মান বিরোধী হয়ে উঠতে থাকে। দুটি দেশই জার্মানি থেকে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে। চেম্বারলেনের বক্তৃতায় হিটলার বিরোধী মনোভাব প্রকাশ্য রূপ পায়।

ইতিমধ্যে মার্চ মাসে জার্মান সেনাদল লিথুয়ানিয়ার মেগেল বন্দর দখল করে। জার্মানি পোল্যান্ডের কাছে ডান্‌জিক ও পোলিশ করিডর দাবি করে। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স পোল্যান্ডের স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর পর দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে গ্রিস ও রোমানিয়াকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করে ব্রিটেন। এই সবের মাধ্যমে চেম্বারলেন জার্মানির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এপ্রিল থেকে অগস্ট পর্যন্ত জার্মানি ও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ চলতে থাকে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স পোলান্ডের আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রশ্নে অনড় থাকলে হিটলার আরও আগ্রসী হয়ে সমগ্র পোল্যান্ড অধিকারের উদ্দেশ্য জানান। হিটলার তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতার বলে রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি আশা করেছিলেন যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স এরপরে আর পোল্যান্ডের নিরাপত্তার ঝুঁকি নেবে না। কিন্তু তাঁর সন্দেহ ভুল প্রমাণিত হয়। ২৫ অগস্ট ব্রিটেন পোল্যান্ডের সঙ্গে পারস্পরিক সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর করে।

Scanned with CamScanner

আদর্শগত দিক থেকে এবং জাতীয় পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স তোষণ নীতির অনুসরণ করে জার্মানির সঙ্গে সমঝোতায় এসে যুদ্ধের সম্ভাবনা এড়াতে চেয়েছিল। এই দিক থেকে বিচার করলে তোষণ নীতি সব সময়ই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তোষণ নীতির মাধ্যমে হিটলারের আগ্রাসন এড়াতে হলে প্রয়োজন ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় আসা। তাহলে হয়তো হিটলার এতটা অকুতোভয় হয়ে তাঁর আগ্রাসন নীতি চলতে পারতেন না। হয়তো বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও এড়ানো যেত। তাই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তোষণ নীতি যদি সঠিকভাবে, বুদ্ধিদীপ্ত সময়োপযোগী কূটনীতিক আবর্ত করে প্রয়োগ করা যেত তা হলে নিঃসন্দেহে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকত।

Scanned with CamScanner